বিজ্ঞান অন্বেষক -এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো: ৯৩৩২৮০৬০২
১ ঘন্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৫ | সংখ্যা ৪ | জুলাই-আগষ্ট /২০০৮ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

সুন্দরবনের বাঘ ও বাঘের অস্তিত্বের সংকট

গত সংখ্যার পর

একটা বাঘ যেখানে থাকে, অনেকটা জায়গা নিয়ে সে তার নিজের রাজত্ব ঠিক করে নেয়। সে এলাকায় অন্য বাঘের প্রবেশ নিষেধ। যদি সে এলাকায় অন্য বাঘ এসে পড়ে, দেখা হয়ে গেলে লড়াই অনিবার্য। খুব কপাল ভাল থাকলে, হেরে পালানো যায়। কারণ বাঘের লড়াই মানে, একজনের মৃত্যু।

বাঘের চামড়া শরীরে বেশ ঢিলেভাবে লাগানো। হাত দিলে মনে হয়, শরীরটা বেশ নরম। কিন্তু চামড়া ছাড়িয়ে ফেললে দেখা যায়, ইস্পাতের পাকান দড়ির মত সুবিন্যস্ত মাংসপেশী। বোঝা যায়, কি অসাধারণ শক্তিধর। একটা গরুর ওজন কম নয়। গরু মেরে গরুটাকে নিয়ে উঁচু বেড়া অবলীলাক্রমে লাফিয়ে পার হয়ে যায়। লাফিয়ে সাড়ে পাঁচ মিটার অর্থাৎ দোতলা সমান এরা উঠতে পারে। আহত বাঘ লাফিয়ে উঠে। গাছের উপর মাচার শিকারিকে নামিয়ে এনেছে। এখন খবরও পাওয়া যায়। বাঘ গাছে চড়তে ও জলে সাঁতার কাটতেও সমান পটু। সুন্দরবন অঞ্চল নিয়ে বাঘের আতঙ্ক বরাবরই। সংবাদপত্রে মাঝেমাঝেই বাঘ দেখা নিয়ে খবর

এর পর ৬ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ণ ও জনস্বাস্থ্য

এই শতাব্দীর শুরুতে, ২০০০-২০০২ সাল জুড়ে, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া কেন্দ্রিক 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইকলজিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড সিন্থেসিস-এর একদল গবেষক জনস্বাস্থ্যের উপর বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব সম্পর্কিত একটি ব্যাপক গবেষণামূলক সমীক্ষা চালান। শুধু মানুষের নয়, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্যও এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দু'বছর ব্যাপী এই গবেষণার ফলাফল বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে মানবজাতিকে চরম সতর্কবার্তা নতুন করে পৌঁছে দিয়েছে। শুধু স্থলের নয়, জলের বা জলের গভীরে, সমুদ্রের প্রাণী ও উদ্ভিদের উপরও গবেষণা চালানো হয়েছিল। জল-স্থল সব স্থানের প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের উপর বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব নিয়ে এটিই প্রথম এত ব্যাপক সমীক্ষা।

তাঁরা দেখেছেন, পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়ার ফলে মশার ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে, একদা মশকহীন এলাকায় মশার অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং বিশেষত মশকবাহিত ভাইরাস ও তজ্জনিত রোগের বিপুল বৃদ্ধি হচ্ছে। এভাবে চললে ব্যাপারটি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। মশার মাধ্যমে শুধু ম্যালেরিয়া ও পাইলেরিয়ার পরজীবীই ছড়ায় না, বহু ভাইরাসঘটিত রোগও ঘটে। এদের মধ্যে আছে যেমন এনকোগলাইটিস (মস্তিষ্ক প্রদাহ) -এর মত ভয়াবহ রোগ, তেমনি আছে পীতজ্বর বা ইয়েলো ফিভার, ডেঙ্গু, চিকুনগুলিয়া ইত্যাদি) চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আদিতে ছিল আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে তা বিশ্বের অন্যত্র, যেমন ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছে। এর পেছনেও বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকার জঙ্গলের হিমাগোগাস (Haemagogus) মশার মাধ্যমে মায়ারো (Mayaro) ভাইরাস ছড়ায় যা চিকুনগুনিয়ার মত জ্বর ও রক্তক্ষরণের মত অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি করে। অস্ট্রেলিয়ার ইডিস ভিজিল্যাক্স নামক মশার মাধ্যমেও রস ফিভার ভাইরাস (Ross fever virus) ছড়ায়। এর থেকে হয় এপিডেমিক পলিআর্থ্রাইটিস। এতে জ্বর ও শরীরের বিভিন্ন গাঁটের তীব্র প্রদাহ মড়কের মত ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই মশকবাহিত ভাইরাসজনিত বহু রোগের কথাই জানা আছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন শুধু এগুলির বৃদ্ধিই ঘটাচ্ছে না, এগুলির বিশ্বায়নও ঘটাচ্ছে। প্রাকৃতিকভাবে এগুলি যে ভূখণ্ডে এক সময় জীবিত থাকতো, তা এখন বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু ভাইরাসজনিত রোগ, অন্যান্য পরজীবী ও জীবানুরাও ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে আক্রান্ত হচ্ছে অন্যান্য দেশের মানুষও।

এর পর ২ পাতায়

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র

একের পর এক বিপত্তি। প্রথমত, মহাশূন্যে গিয়ে আবিষ্কৃত আটলান্টিসের ফাটল। দ্বিতীয়ত, হঠাৎ কম্পিউটার খারাপ হয়ে পড়া। তৃতীয়ত, ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণের সময়ে আবহাওয়াজনিত জটিলতা। ২০০৭ এর ২২ জুন। রাতভর টিভির পর্দায় চোখ। প্রার্থনা— মেয়েটি যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে। আসলে ২০০৩-এর কল্পনা চাওলার অভিশপ্ত কলম্বিয়া অভিযানের স্মৃতি তখনো তো ঝাপসা হয়নি। 'মেয়েটি' কে? নিশ্চয়ই এতক্ষণে মনে পড়েছে। হ্যাঁ, মেয়েটি সুনীতা পান্ড্য উইলিয়ামস। ঐ তারিখে আটলান্টিস সুনীতা সহ সাত নভশ্চরকে নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসে। আটলান্টিস অবতরণ করে ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস বিমান ঘাঁটিতে। এক রুদ্ধশ্বাস নাটকের অবসান ঘটে। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তামুক্ত হয় মহাকাশচারীদের পরিবার, ও অগণিত মানুষ। গর্বিত নাসা তাদের সাফল্যে পুলক প্রকাশ করে। আমাদেরও বিশেষ গর্ব এই কারণেই যে, প্রথম যে মহিলাটি ১৯৫ দিন মহাশূন্যে কাটালেন, মহাশূন্যেই ওয়াকারের সাহায্যে

এর পর ৪ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জনস্বাস্থ্য

১ পাতার পর

যেমন আগে ম্যালেরিয়া বা কলেরার মত রোগ আমেরিকায় প্রায় হতই না বলা যায়। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সালের পর এ ছবিটা পাল্টাতে শুরু করেছে। এখন নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, মিশিগান, ফ্লোরিডায় এসব রোগ শুরু হয়েছে।

উষ্ণায়নের ফলে উষ্ণ অঞ্চলীয় সংক্রমণ (Tropical vifection) নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় (tempenate zone), এমনকি শীতপ্রধান স্থানেও ছড়িয়ে পড়ছে। এটি আরও ভয়াবহ। পৃথিবীর অন্যান্য ভৌগোলিক এলাকার তুলনায় উষ্ণ অঞ্চলে রোগজীবাণু, পরজীবী ইত্যাদির প্রজাতিগত বৈচিত্র্য অনেক বেশি, কিন্তু তাদের প্রতিটির অন্তর্গত সদস্যের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই ধরনের প্রজাতির সংখ্যা কম, কিন্তু তাদের প্রতিটির সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। সহজ কথায়, উষ্ণ অঞ্চলে নানা ধরনের জীবাণু, পরজীবী ইত্যাদির সংখ্যা যদি হয় কয়েক লক্ষ, তবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ইত্যাদি হয়তো আছে কয়েক হাজার। কিন্তু উষ্ণ অঞ্চলের এ গুলির এক একটিতে যদি ওরা থাকে কয়েক লক্ষ করে, তবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এক একটি জীবাণু ইত্যাদির সংখ্যা হয়তো কয়েক কোটি। উষ্ণায়নের ফলে উষ্ণ এলাকার বহু জীবাণু, পরজীবী, ভাইরাস ইত্যাদি একদা শীতলতর ঐ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে যেখানে হয়তো কয়েক দশক আগেই তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যনতুন দূরারোগ্য রোগ। আরো মুস্কিল হচ্ছে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উষ্ণতর এলাকা থেকে আসা ঐসব অনাহূত অতিথিরা জাঁকিয়ে বসছে বটে, কিন্তু ওখানকার আদি বাসিন্দাদের হঠাতে পারছে না, কারণ তারা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় অনেক বেশিই ছিল। আর এসবের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পুরনো রোগব্যাধি যা ছিল তা তো আছেই সঙ্গে দেখা দিচ্ছে স্থানীয়ভাবে অজানা অন্যান্য রোগও। তার জন্য নতুন ওষুধ আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। অর্থাৎ শুধু রোগভোগ বা শ্রমাদিবস নষ্ট নয়, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উপরও চাপ পড়ছে।

মানুষ তবু গবেষণা করে, ব্যবসা করে, নতুন নতুন ওষুধ-যন্ত্রপাতি দিয়ে এইসব রোগের মোকাবিলা করে রোগের কষ্ট আর মৃত্যুর হার কমানোর নিরন্তর নিরলস প্রয়াস চালাতে পারছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদের মধ্যে ঐ ধরনের গবেষক নেই। ফলে উষ্ণায়ন তাদের ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে মানুষের স্বাস্থ্য আর দৈনন্দিন জীবনও বিপর্যস্ত হচ্ছে। এবং ক্রমশ আরো ভয়ঙ্কর এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে — যার শেষ সীমায় আছে এই বিশ্ব থেকে অবলুপ্তি।

উষ্ণায়ন কিভাবে জীবকুলের বিপর্যয় ঘটায় তা পূর্বোক্ত গবেষকরা ১৯৯৮-এর মত অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ এল নিনো বৎসর (unusually warm el nino year of 1998)-এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করেছিলেন। ঐ সময় প্রশান্ত মহাসীগরীয় উষ্ণ অঞ্চলের মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণতা বিশেষত আফ্রিকা ও আমেরিকার মত বিস্তীর্ণ পড়েছিল বিশ্বের অন্যত্রও। তখন পৃথিবীর নানা স্থানের বিপুল সংখ্যক কোবাল-এর অপমৃত্যু ঘটেছিল। আমেরিকার মাইন (Maine) সাগরের ঝিনুকদের মধ্যে এমন এক ধরনের পরজীবীর আক্রমণ ঘটেছিল, যা স্বাভাবিকভাবে অনেক দক্ষিণের জলে থাকত। আফ্রিকার সিংহদের হিংস্রতা, খিটখিটে মেজাজ তথা মানসিক বৈকল্য ঘটেছিল। সারস, শকুন ইত্যাদির মত প্রাণিদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের মড়ক শুরু হয়েছিল। রাজা প্রজাপতির মধ্যে পরজীবীর সংক্রমণ ঘটেছিল বীভৎস মাত্রায়। পাশাপাশি ঐ ১৯৯৮ সালেই গবাদি পশু ও মানুষের মধ্যে রিফ্ট ব্যালি ফিভার (rift valley fever) নামে ভাইরাসঘটিত এক ভয়াবহ রোগের ব্যাপক মড়ক দেখা দিয়েছিল। এমন কি তার চার-পাঁচ বছর পরেও, অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যাকটিরিয়া রীফ-এর দক্ষিণাঞ্চলে হেরন দ্বীপের বিপুল সংখ্যক কোরাল-এর মধ্যে দেখা দেওয়া রঙ বিকৃতি ও অস্বাভাবিকত্বের পেছনেও ঐ উষ্ণায়নকেই দায়ী করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে ঐ 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইকলজিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড সিন্থেসিস'-এর মুখ্য গবেষক, আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রু হার্ভেল (Drew Harvell) মন্তব্য করেছিলেন, "বিশ্ব উষ্ণায়নের ব্যাপারে আমাদের আরও অনেক বেশি তৎপর হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সামনে শুধু উষ্ণতর বিশ্ব নয়, অসুস্থতর বিশ্বও অপেক্ষা করছে।" সহ গবেষক, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্ড্রু ডবসন সতর্ক করেছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের পাশাপাশি মানুষ নিজে প্রত্যক্ষভাবে যে হারে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে তাতে এই বিপদ আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরেক সহগবেষক রিচার্ড আটফেল্ড জানিয়েছেন, "(বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে) রোগের ঘটনা যে হারে বেড়েছে ও বাড়ছে তা বিস্ময়কর ও চরম আতঙ্কজনক।"

এই আতঙ্কের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্বের বিপন্নতা ও অবলুপ্তির সম্ভাবনা থেকেও। ইতিমধ্যেই ভারতের কানহা জাতীয় উদ্যানের বাঘ, চীনের ওলং-এর বৃহৎ পান্ডা, আমেরিকার ইয়েলোস্টোন জাতীয় উদ্যানের হিংস্র ভালুকের মত অনেক প্রাণীর এবং কিছু কিছু উদ্ভিদেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এতে সর্বশেষ সংযোজন হয়তো হবে মানুষ।

আসলে ঠান্ডা আবহাওয়ার ফলে রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী, পোকামাকড়, ছত্রাক ইত্যাদির সংখ্যা শতকরা ৯৯ ভাগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে। কিন্তু উষ্ণায়নের ফলে শীতকালের সময়কাল যেমন কমছে, তেমনি শীতের তীব্রতাও কমছে। আর গরম আবহাওয়া ও তার সঙ্গে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার সময়কাল দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিকভাবে রোগজীবাণু, পোকামাকড়, ছত্রাক, পরজীবী ইত্যাদি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হত ঐ ছন্দটিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। তার ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিচ্ছে অভূতপূর্ব রোগ আর মড়ক। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কলেরা, এনকেফালাইটিসের মত বহু রোগের বিশ্বায়ন ঘটা শুরু হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিশেষত মশকবাহিত রোগের সংক্রমণের হার এখনই শতকরা ৬৫ ভাগ বেড়েছে বলে জানা গেছে।

এই অস্বাভাবিক প্রকৃতিবিরোধী উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদই বিপদ আর রোগের সম্মুখীন হলেও শহরাঞ্চলের মানুষ বিপদে পড়ছে তুলনামূলকভাবে বেশি। শহরে পিচের রাস্তা, কংক্রিটের বাড়ির তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি। গাছপালা সংখ্যায় অনেক কম। তাই চারপাশের গ্রামাঞ্চলের মাঝে শহরগুলি বেশিক্ষণ বেশি বেশি করে গরম থাকে। একে বলা হচ্ছে উত্তপ্ত দ্বীপের ঘটনা (heat island phenomenon)। স্বাভাবিকভাবে আমাদের শরীর যে পরিমাণ তাপ ও তাপমাত্রার মোকাবিলা করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রা

এরপর ৩ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জনস্বাস্থ্য

২ পাতার পর

শহরে মানুষকে বিপদে ফেলছে আরো বেশি করে। ইতিমধ্যেই নিউইয়র্ক শহরে মৃত্যুহার বাড়ছে। একটি হিসেবে দেখা গেছে, ২০২০ সালের মধ্যে উষ্ণায়নের কারণে নিউইয়র্ক শহরে মৃত্যুহার শতকরা অন্তত ১৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। উষ্ণতর পৃথিবীর সমৃদ্ধিশালী শহরগুলি ভরে থাকবে অসুস্থ-বিকলাঙ্গ-মুমূর্ষু মানুষে।

বিপদে আরো বেশি করে পড়ে শিশুরা, বৃদ্ধেরা এবং হাঁপানি ও হৃদরোগের রোগীরা। কারণ এদের মধ্যে উচ্চ তাপ মোকাবিলা করার ক্ষমতা বয়স্কদের তুলনীয় অনেক কম। ফলে এদের মৃত্যুহার, রোগভোগ এবং তার পেছনে সময় ও অর্থব্যয়— সবই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

অন্যদিকে বেশি তাপে মাটির কাছাকাছি ও জোন গ্যাস তৈরি হয় বেশি করে। এই ও জোন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে শুধু আবালবৃদ্ধবনিতা নয়, গবাদি পশু বা স্থলচর সমস্ত প্রাণিই বিপদগ্রস্ত হয়। আবার যে কারণে বিশ্বের এই অভূতপূর্ব উষ্ণায়ন সেগুলি যেসব গ্যাসের জন্য ঘটে (গ্রীন হাউস গ্যাসেস, যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, মিথেন ইত্যাদি), সেগুলির প্রভাবে বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন-এর পরিমাণ কমে। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি অতিমাত্রায় পৃথিবীতে পড়ছে এবং আমাদের শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। এর প্রভাবে ত্বকের ক্যান্সার, চোখের ছানি এবং অন্যান্য রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে

আগেই বলা হয়েছে এই ধরনের উষ্ণায়নে শিশু ও বৃদ্ধেরা বেশি আক্রান্ত হয়। বিশেষত দেশের ভবিষ্যতের নাগরিক ও সম্পদ, যাদের শ্রম ও মেধায় বিশ্বের বিকাশ ঘটছে ও বিশ্ব সচল থাকবে, ওই শিশুরা রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে সামুহিক বিপদ অনেক। গর্ভস্থ অবস্থা থেকে কৈশোর— এ সময়ে শরীরের উপর প্রকৃতি-বিরোধী ক্রিয়াকান্ড ও পরিবেশ দূষণ কুপ্রভাব ফেলে সবচেয়ে বেশি। গর্ভস্থ অবস্থায় ভ্রুণের কোষবিভাজনের হার অনেক বেশি। ফলে এইসময় যেকোন অস্বাভাবিকত্ব ভ্রুণকেই অসুস্থ করে তোলে। আর এর ফলে জন্ম নেয় শারীরিক ও বিশেষত মস্তিস্কের জন্মগত ত্রুটিযুক্ত, অস্বাভাবিক মননের শিশু। জন্মের পর কয়েকমাস শিশুরা বিপাকীয় প্রক্রিয়া অপরিণত থাকে। এর ফলে দূষিত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করার এবং সামগ্রিকভাবে প্রকৃতির অস্বাভাবিক পরিবেশকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা থাকে অনেক কম। এর ফলেও বিপদ বাড়ে।

একটি শিশু শরীরের ওজন অনুযায়ী বয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশি জল খায়, অনেক বেশি খাবার যায় এবং অনেক বেশি বাতাস শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। যেমন শান্ত অবস্থায়। একটি শিশু বয়স্কদের তুলনায় শারীরিক ওজনের হিসাব অনুযায়ী দ্বিগুণ বেশি বাতাস শ্বাসের সঙ্গে নেয়, প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু ৮-১২ গুণ বেশি জল খায়। এক থেকে পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু বয়স্কদের তুলনায় ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি খাবারও খায়। অন্যদিকে দূষিত পদার্থ শিশুদের অন্ত্র থেকে শোষিত হয় বয়স্কদের তুলনায় অন্তত পাঁচগুণ বেশি (যেমন সীসা, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সমীক্ষার শেষে মন্তব্য করা হয়েছিল, "এমনকি ইয়োরোপের ধনী দেশগুলিতেও অসুস্থ পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে শিশুদের উপর। অন্যদিকে ধনীদের তুলনায় গরীবেরা বিপদে পড়ে আরো বেশি করে।" এমনকি খোদ আমেরিকায় প্রতিবছর কমপক্ষে ৬৫০০ শিশু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মানোর কারণে মারা যায়। (২০০১ সালের পরিসংখ্যান) এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ শিশুর এই ত্রুটির পেছনে আগে থেকেই জানা কোন কারণ ভূমিকা পালন করেছে বলে ধরা সম্ভব হয়। বাকি শতকরা ৮০ ভাগের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে থাকে। এবং এগুলির পেছনে পরিবেশগত নানা কারণই যে প্রধান তার প্রমাণ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে, যার অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের অস্বাভাবিক উষ্ণতা ও তার সামগ্রিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

উষ্ণায়ন তথা দূষণের প্রত্যক্ষ শারীরিক প্রভাব ছাড়া বিশ্ব উষ্ণায়ন যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, তার ফলে প্রাণহানি, সংক্রামক রোগ, মড়ক ইত্যাদিও ঘটছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৩ থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর বিগত ৪০ বছরে ০.২ থেকে ০.৩ ডিগ্রি। যদি এইভাবেই চলে এবং কোন জরুরি অবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তবে আগামী ১০০ বছরে এই তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটবে ১.৪ থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ভয়াবহ। এর ফলে হিমবাহ ও মেরু বরফ গলে সমুদ্রজলের যে স্ফীতি ঘটবে তা এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। (যেমন জানা গেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এখন নাকি প্রতিবছর ২৩ সেন্টিমিটার করে ছোট হয়ে যাচ্ছে) পৃথিবীর বড় বড় ২০টি শহরের ১৩টিই সমুদ্রের ধারে। সামুদ্রিক তলের বৃদ্ধির ফলে এগুলি বিলুপ্ত হবে। এছাড়া সমুদ্রোপকূলবর্তী ছোট ও মাঝারি অসংখ্য অন্য শহর তো আছেই। আছে অন্যান্য গ্রাম ও জনপদ। মালদ্বীপ ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের মত ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলি তো পৃথিবীর মানচিত্র থেকেই মুছে যাবে। সঙ্গে থাকছে অস্বাভাবিক খরা, প্রবলতম ঝঞ্ঝা, মাত্রাতিরিক্ত বন্যা। আর এসবের হাত ধরাধরি করে রোগ, মড়ক, মৃত্যু।

১৯৯৫-এর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনেই বিজ্ঞানীরা এইসব আশঙ্কার কথা শুনিয়েছিলেন। এটিও জানা গেছে যে বেপরোয়া শিল্পায়ন, অরণ্য ধ্বংস ও সীমাহীন ভোগবাদ এই উষ্ণায়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ি। এর তুলনায় অনেক বেশি দায়ি পৃথিবীর ধনীরা, ধনী দেশগুলি। আমেরিকার একজন মানুষ গড়ে একজন একজন এশিয়াবাসীর তুলনায় ১১ গুণ, ল্যাটিন আমেরিকার একজনের তুলনায় ৯ গুণ এবং একজন আফ্রিকাবাসীর তুলনায় ১৩ গুণ বেশি কার্বন বাতাসে ছাড়ে। উষ্ণায়নের জন্য এটিই প্রধানত দায়ি। ১৯৫০ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে আমেরিকা মোট ৫০৭৯৫০ লক্ষ টন কার্বন বাতাসে ছেড়েছিল। সে তুলনায় ঐ সময়ে ভারত ছেড়েছিল ৪২৩৫০ লক্ষ টন, চীন ১৫৭১৫০ লক্ষ টন ইত্যাদি। বৈষম্য স্পষ্টই বোঝা যায়।

এইভাবে উষ্ণায়ন তথা পরিবেশের বিপর্যয়ের পেছনে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির ভূমিকা তুলনায় অনেক কম। কিন্তু তার ফলে যেসব প্রাকৃতিক বিপদ ঘটে তা সর্বত্র ঘটলেও তার থেকে মানুষ ও সম্পদের ক্ষতি বেশি হয় গরীব দেশগুলিতেই। তাকে সামাল দেওয়ার ও ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে ওঠার ক্ষমতাও এদের কম। সাম্প্রতিক ভয়াবহ ঝঞ্ঝা সিডার (cider) বাংলাদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে যা ঘটিয়েছে তার থেকে এই বৈষম্যের বিপদ বোঝা যায়। এইভাবে পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান টর্নাডো, খরা, বন্যা ইত্যাদিতে পৃথিবীর নানা দেশ ভুগলেও এবং আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকা বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গরীব দেশগুলির গরীব মানুষেরা বেশি বিপদে পড়লেও, তার পেছনে প্রধান ভূমিকা কিন্তু পালন করে পৃথিবীর শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি, পাশাপাশি গরীব দেশের ধনীরাও, যারা অনেক বেশি

এরপর ৪ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

৩ পাতার পর

ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে।

উষ্ণায়ন জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় জাতীয় অর্থনীতিকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তা অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ থেকে আঁচ করা যাবে। ২০০২-এর মার্চ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় বিগত শতাধিক বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ খরা শুরু হয়েছিল। মার্চ থেকে নভেম্বর— এই নয় মাস সময়কালে সেখানে অর্থনাবৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকে। এই সময়কালে ১৯৫৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টিপাত ঘটেছিল প্রতি মাসে ২১.৮ মিলিমিটার। ১৯৯৪-এ তা কমে দাঁড়ায় ১৬.৫ মিলিমিটারে এবং ২০০২-এ ১৪.১ মিলিমিটার। এর পেছনের কারণ হিসেবে বিশ্ব উষ্ণায়ণকেই স্পষ্টভাবে দায়ি করা হয়েছে। এর ফলে সে দেশে ২০০৩-এ শীতকালীন শষ্য উৎপাদন কমেছে ১৪৮ লক্ষ টন, মোট রফতানি কমেছে ১২৯০ কোটি ডলার ইত্যাদি এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের হার কমেছে শতকরা ০.৭৫ ভাগ। স্পষ্টত এই একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় কিভাবে উষ্ণায়নের ফলে সারা বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ ও উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। আর এটিও স্পষ্ট যে অবধারিতভাবে এসবের প্রভাব পড়ে খাদ্যগ্রহণ ও পুষ্টি, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সবগুলির উপরই। এবং তার দীর্ঘস্থায়ি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় ভোগে দরিদ্র দেশ ও দরিদ্র মানুষই। কিন্তু শেষ বিচারে ধনীরাও রেহাই পায় না।

সব মিলিয়ে বিশ্বের মাত্রাতিরিক্ত অস্বাবাবিক উষ্ণায়নের জনস্বাস্থ্যগত বিরূপ প্রভাব ভয়াবহ। আশার কথা ক্রমশ বিশ্বের মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে, তার থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, কার্বন ডাই-অক্সাইড বা ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের মত যেসব গ্যাস এই উষ্ণায়নের পেছনে ভূমিকা পালন করছে তা কমানোর চেষ্টা চলছে। তবু এরই মধ্যে অন্য দিকও আছে। যেমন আমেরিকার মত ধনীদেশগুলি এই উষ্ণায়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও, বিশ্ব ব্যাপী বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের ধারাবারিকতা টিকিয়ে রাখতে আমেরিকা সরকার তায় দায় এড়িয়ে যেতে চাইছে। উষ্ণায়ন সৃষ্টিকারী গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সই করতে টালবাহানা করা শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে অন্য ধরনের নানা খেলাও খেলা হচ্ছে। যেমন ইজরায়েলের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় ও জার্মানির রুর (Ruhr) বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গবেষক 'গবেষণা' করে জানিয়েছেন (২০০৩), এই উষ্ণায়নের পেছনে শতকরা ৭৫ ভাগই দায়ি পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা, মহাবিশ্ব থেকে বিশ্বের বুকে আছড়ে পড়া মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic rays)। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মত উষ্ণায়ন সৃষ্টিকারী গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির নিয়ন্ত্রণের তথা লাগামছাড়া শিল্পায়ন, ব্যবসা ও ভোগ্যপণ্য ব্যবহার কমানোর ততটা প্রয়োজন নেই। এইসব গবেষক নাকি বিগত ৫০ কোটি বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ও কসমিক রে (মহাজাগতিক রশ্মি)-র হিসাব করে এই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছেন। অবশ্য অন্যান্য বহু গবেষকই এই গবেষণার ফাঁক ও ফাঁকিগুলিকে চিহ্নিত করেছেন।

যাই হোক, বিশ্ব উষ্ণায়ন কিভাবে ঘটছে, তার সম্ভাব্য সমাধান বা অন্যান্য প্রভাবের বিস্তারিত দিকগুলি এখানে মূল আলোচ্য নয়। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন ও বিশ্ব জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে এটুকু অন্তত জানা প্রয়োজন যে, পৃথিবী থেকে সুস্থ মানবজাতির অবলুপ্তি আটকাতে গেলে শুধু যান্ত্রিকভাবে উষ্ণায়নের আলোচনাই যথেষ্ট নয়, সমাধানের জন্য সঙ্গে রাজনৈতিক তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

— ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও লেখক

তথ্যসূত্র :

1. Down to Earth (Delhi)-র বিভিন্ন সংখ্যা
2. Text Book of Preventive & social Medicine (Pasu & Park)
3. Harrisons Previciples of Internal Medicine ইত্যাদি।

মহাকাশ কেন্দ্র

১ পাতার পর

ম্যারাথনে অংশ নিলেন এবং সবচেয়ে বেশি সময় ২৯ ঘণ্টা ১৭ মিনিট স্পেসওয়াক করলেন তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

কোথায় গিয়েছিলেন সুনীতারা? কেন-ই বা গিয়েছিলেন? তাঁরা গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র (International Space Station সংক্ষেপে ISS)-এ। মহাকাশ ফেরী যান (Space Shuttle) আটলান্টিসে চেপে সুনীতারা এই মহাকাশ কেন্দ্রে যান। মহাকাশে স্থাপিত একটি গবেষণা কেন্দ্র (research facility assembled in space) হল আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'NASA' রাশিয়ার 'RKA', জাপানের 'JAXA', কানাডার 'CSA' এবং ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগে এবং পরিকল্পনায় ISS নির্মিত হয় এবং মহাকাশে স্থাপিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ISS-এর উচ্চতা খুব বেশি নয়। অনুকূল অবস্থায় খালি চোখেই তা' দেখা যায়। পৃথিবীর চারপাশে ISS-এর ঘোরার পথটি বৃত্তাকার নয়, একটু চাপা-উপবৃত্তাকার। ISS যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে তখন পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ISS-এর দূরত্ব হয় ৩১৯.৬ কিলোমিটার এবং যখন সবচেয়ে দূরে থাকে তখন সেই দূরত্ব হয় ৩৪৬.৯ কিমি। ISS ঘণ্টায় ২৭৭৪৪ কিমি গড় দ্রুতিতে পৃথিবীকে আবর্তন করছে। ২৪ ঘণ্টা সময়ে পৃথিবীকে আবর্তন করছে ১৫.৭ বার। পৃথিবীকে একবার আবর্তন করতে ISS এর সম য় লাগে ৯১.২০ মিনিট।

বিংশ শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ার দিকে NASA পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের স্যালিয়ুট (Salyut) এবং মীর (Mir) মহাকাশ কেন্দ্রের অনুরূপ মহাকাশ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিকূলতা ও অস্থিরতার কারণে এই পরিকল্পনা অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে মার্কিন প্রশাসন একটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে এবং ইউরোপ, রাশিয়া, জাপান ও কানাডাকে এই মহাকাশ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প (project)-এর সাথে যুক্ত করে নেয়। ১৯৯৩ সালে এই প্রকল্প ঘোষিত হয়। প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয় স্পেস স্টেশন আলফা (space station Alpha)। অংশগ্রহণকারী সমস্ত স্পেস এজেন্সী সমূহের প্রস্তাবিত মহাকাশ কেন্দ্রগুলি, যেমন NASA-এর 'ফ্রিডম' (Freedom), রাশিয়ার 'মীর-২' (Mir-2) এবং ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সীর 'কলম্বাস' (columbus)-কে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ব্রাজিল এবং ইটালীর স্পেস এজেন্সী ISS প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে। চীন যুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

প্রথম ISS মডিউল (module) জারিয়া (zarya)-কে উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৯৮ এর ২০ নভেম্বর। উৎক্ষেপণের এরপর ৫ পাতায়

মহাকাশ কেন্দ্র

৪ পাতার পর

জন্য প্রোটন রকেটের সাহায্য নেওয়া হয়। জারিয়ার দৈর্ঘ্য ১২.৬ মিটার, ব্যাস ৪.১ মিটার, ভর ১৯৩২৩ কেজি। জারিয়া উৎক্ষেপণের দু'সপ্তাহ পরে এনডেভার (Endeavour)-এর সাহায্যে ইউনিটি নোড-১ (Unity Node-1) মডিউলটিকে জারিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়। ২০০০ সালের ১২ জুলাই তারিখে রাশিয়ান মডিউল 'ভেজদা' (zvezda)কে ISS-এর সাথে যুক্ত করা হয়। মার্কিন মহাকাশচারী ইউরি গিড্‌জেনকো (Yuri Gidzenko) ও সের্গেই ক্রিকালেভ (Sergei Krikalev) ২০০০ সালের ২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের প্রধান অংশ বলতে চারটি মডিউল। রাশিয়ার দুটি — জারিয়া (Zarya) ও ভেজদা (zvezda) এবং আমেরিকার দুটি— ডেস্টিনি (Destiny) ও ইউনিটি (Unity)। এছাড়া আছে কোয়েস্ট জয়েন্ট এয়ারলক এবং পির্‌স ডকিং কম্পার্টমেন্ট। ISS-এর সমস্ত মডিউলগুলি যুক্ত করার কাজ শেষ হলে এর আয়তন দাঁড়াবে ১০০০ ঘনমিটার, ভর দাঁড়াবে ৪০০০০০ কিলোগ্রাম, আউটপুট ক্ষমতা ১০০ কিলোওয়াট মডিউলের দৈর্ঘ্য ৭৪ মিটার। বর্তমানে ISS-এর দৈর্ঘ্য ৫৮.২ মিটার, প্রস্থ ৪৪.৫ মি., উচ্চতা ২৭.৪ মিটার, আয়তন ৪২৪.৭৫ ঘনমিটার এবং সোলার অ্যারে-র বিস্তার ৭৩.১৫ মিটার। ২০০৭-এর জুন মাস পর্যন্ত ISS তার কক্ষপথে ২৩১৬ দিন অতিবাহিত করেছে, ৪৭৪৬৬ বার পৃথিবীকে আবর্তন করেছে এবং ২০০ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। ISS প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে ২০১০ সালে এবং ২০১৬ পর্যন্ত ISS কর্মরত অবস্থায় থাকবে।

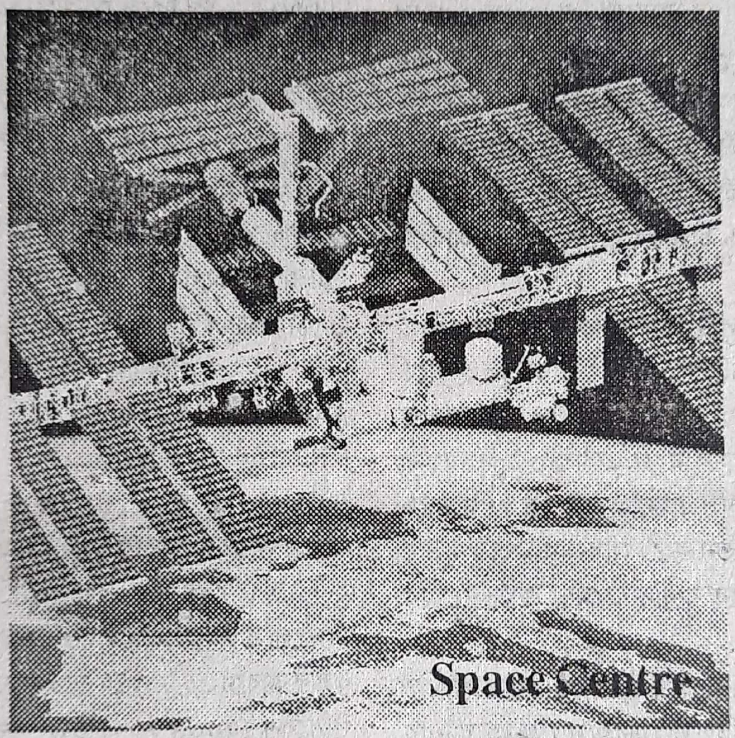

ISS-এর বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস সূর্য। সোলার প্যানেলের সাহায্যে সৌরশক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বায়ুমন্ডলীয় চাপ, অক্সিজেন মাত্রা, জল সরবরাহ এবং অগ্নি নির্বাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয় ISS এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল এ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম (ECLSS)-এর সাহায্যে। মহাকাশচারীদের ব্যবহৃত জল এবং উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থের সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সঞ্চয়ের কাজগুলি এই সিস্টেমটিই সম্পন্ন করে। স্টেশনের অভ্যন্তরে ইলেকট্রন সিস্টেম (Elecktron System) অক্সিজেন উৎপাদন করে। বিপাকে উপজাত বর্জ্য পদার্থগুলিকে অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ফিল্টার পদ্ধতিতে অপসারণ করা হয়। কয়েকটি কন্ট্রোল মোমেন্ট জাইরোস্কাপ (CMGs)-এর সাহায্যে ISS-এর দিকস্থিতি (Orientation) বজায় রাখা হয়। অর্থাৎ, ইউনিটি মডিউলের সামনে ডেস্টিনি মডিউল, পোর্ট সাইডে পি ট্রাস এবং পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকবে পির্‌স ডকিং কম্পার্টমেন্ট।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের ভিতর ও বাইরের পরিবেশ, পৃথিবীর পরিবেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ISS-এর উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান, সমুদ্রপৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের ৮৮ শতাংশ। কিন্তু ISS-এর অভ্যন্তরে মহাকর্ষ বলসহ সমস্ত বল প্রায় অনুপস্থিত। মাইক্রোগ্রাভিটির পরিবেশ। কাজেই, মহাকাশ কেন্দ্রের অভ্যন্তরের অস্বাভাবিক (পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে) পরিবেশে মহাকাশচারীদের চলাফেরা, খাদ্যগ্রহণ, নিদ্রা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি আমাদের সাথে মেলে না। এজন্য মহাকাশ যাত্রার আগে মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কঠোর অনুশীলন করতে হয়।

মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যেই ISS স্থাপন করা হয়েছে। পৃথিবীর পরিবেশে কোন একটি পরীক্ষা যে ফল দেয়, সেই পরীক্ষাটি মহাকাশ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে করলে ফলাফল কী হবে সেটা দেখা এবং জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাইক্রোগ্রাভিটির পরিবেশে মানুষ দীর্ঘদিন থাকলে তার কী পরিবর্তন হতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পেশীর ক্ষয়িষ্ণুতা, হাড়ের ক্ষয়, শরীরের অভ্যন্তরে প্রবাহী পদার্থের স্থানান্তরণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। মহাকাশ কেন্দ্রে ভারহীন অবস্থার পরিবেশে প্রাণি ও উদ্ভিদের বিবর্তন, বিকাশ ও বৃদ্ধি কিভাবে ঘটে তাও পরীক্ষা করে দেখছেন মহাকাশচারী বিজ্ঞানীরা। গবেষণার মূল ক্ষেত্রগুলি হল জীববিদ্যা (বায়োমেডিক্যাল, বায়োটেকনোলজি) পদার্থবিদ্যা (প্রবাহী পদার্থবিদ্যা, মেটিরিয়াল সায়েন্স, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা) জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব এবং আবহ বিদ্যা। এ সকল ক্ষেত্র সংক্রান্ত নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা মহাকাশচারী বিজ্ঞানীরা করে চলেছেন।

মহাকাশ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে মহাকাশচারী বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলসমূহ মানবজাতির জ্ঞানভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারা সংযোজিত করবে। মহাকাশ প্রযুক্তি উন্নত থেকে উন্নততর হবে।

— গোবিন্দ দাস, ৯৩৩১৪১০৭৩৮

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার-কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম।

মো: ৯৪৩৪২১২০৪২। জলপাইগুড়ি— তপন সেন, সেন ফার্মেসী, রেল বাজার আলিপুর দুয়ার জং। কলকাতা : বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩। চন্দন রায়/চন্দন সুরভি দাস, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ২/১৪৫, বিজয়গড়, যাদবপুর, কল-৩২।

মো: ৯৮৩১৬৯৩০৩৮

সুন্দরবনের বাঘ

১ পাতার পর

বের হয়। লোকালয়ে বাঘ, ব্যস্ত বনকর্মী থেকে গ্রামবাসী (গণশক্তি, ক্যানিং ২৮শে নভেম্বর'০৬) সুন্দরবনের ঝড়খালিতে সোমবার রাতে লোকালয়ে বেরিয়ে পড়ে সুন্দরবনের বাঘ। সারারাত ধরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা মশাল জ্বেলে, ট্যাঁড়া পিটিয়েছে। বনদপ্তরের কর্মীরা, স্থানীয় গ্রামবাসীদের কথায় ১২-১৩ ফুট লম্বা পুরুষ বাঘটিকে গভীর জঙ্গলে পাঠাবার চেষ্টা চলছে। বনদপ্তরের কর্মীরা বাংলোর তিনদিক কাঁটাতারে ঘিরে দিয়েছেন। মাতলা নদী পেরিয়ে হেড়োডাঙার জঙ্গল দিয়ে বাঘটি ঝড়খালিতে এসেছে বলে বনদপ্তর জানিয়েছে।

হিঙ্গলগঞ্জে বাঘ দেখে আতঙ্কে বাসিন্দারা (বর্তমান ২৪/১১/০৬) হিঙ্গলগঞ্জ থানার সুন্দরবন সংলগ্ন দু'নম্বর সামসের নগর গ্রামের সামনে জঙ্গলের মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে দু'টি বাঘ দেখা গেছে। এই ঘটনায় ওই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ গ্রামের কোন ঘেঁষে দু'টি বড় বাঘ দেখে গ্রামবাসীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। লাঠিপেটা দিয়ে গ্রামবাসীরা বাঘ তাড়াতে লেগে পড়েন, ইট পাথর মেরে বাঘ তাড়ালেও গ্রামবাসীরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

জঙ্গল ও জনপদের মধ্যে যে খালটি গ্রামবাসীদের বাঘের হামলা থেকে এতদিন রক্ষা করে এসেছে। সেই কুঁড়েখালি খাল অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। ফলে জঙ্গল পেরিয়ে অবাধে বাঘ এই জনপদে ঢুকে পড়তে পারছে। এর আগে একইভাবে সামসের নগর এলাকায় জঙ্গল ঘেঁষা অনেক বাড়িতেই বাঘ ঢুকে গরু, ছাগল এমনকি মানুষও টেনে নিয়ে গেছে। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে তিন নম্বর সামসের নগরে সুভাষ বাওয়ালির নয় বছরের মেয়ে রূপালিকে বাঘ থাবা মেরে বারান্দা থেকে তুলে নিয়ে যায়।

স্বামী-স্ত্রী বাড়ির সবাই মিলে বাঘের উপর ঝাপিয়ে পড়ে মেয়ের শরীরটা ফেরত পেলেও সে শরীরে তখন প্রাণ ছিল না। এধরনের অজস্র ঘটনার সাক্ষী সামসের নগরের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় প্রতি রাত্রে কুঁড়েখালি খালের ওপরের জঙ্গলের ধারে বাঘের ডাক তারা শুনতে পান।

হিঙ্গলগঞ্জে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ফিরলেন গৃহবধূ বিজয়া বাইন (বর্তমান ২৩-০২-০৭) দশাসই এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখেসজোরে দায়ের কোপ মেরে বাঘকে ঘায়েল করে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন সুন্দরবন সংলগ্ন প্রত্যন্ত গাঁয়ের এক বধূ। বিজয়া দেবীর ঘাড়ে মাথার পাশে, পিছনে বাঘের থাবায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তবে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। সুশীল বাইন বলেন, আমরা গরিব মানুষ। সুন্দরবনে দল বেঁধে বাগদার পোনা (মিন), কাঁকড়া ধরে, মধু সংগ্রহ করে কোনওরকমে সংসার চালাই। প্রতিদিনের মত ঐদিন আমরা সুন্দরবনের কুঁড়েখালি জঙ্গলের ধারে মিন ধরতে যাই। জলে বাগদার মিন না ওঠায় দলছুট হয়ে আমি একটু দূরে জঙ্গলের দিকে ঢুকে পড়ি। স্ত্রীর হাতে ধারাল দা দিয়ে সাবধানে থাকতে বলে আমি এরপর জলে নেমে পড়ি। তখন দুপুর ১টা। হঠাৎ পিছনের ঝোপের আড়াল থেকে বিরাট এক বাঘ প্রথমে বিজয়ার ঘাড়ে থাবা বসায়। ধস্তাধস্তির ফলে বিজয়ার শরীরের অনেক জায়গায় বাঘ থাবা মারতে থাকে। বাঘটি বিজয়াকে জঙ্গলের দিকে খানিকটা টেনেও নিয়ে যায়। তখনই প্রাণে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে বিজয়া হাতের দা দিয়ে সজোরে বাঘের মুখে পরপর কোপ মারে। বিজয়ার চিৎকার আর বাঘের গোঙানিতে বাকি সবাই এসে বাঘের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। কেউ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বাজিও ফাটায়। শেষে ঘায়েল বাঘ জঙ্গলে পালিয়ে যায়। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে যেতেই রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত বিজয়াদেবীকে নৌকা করে সামসের নগরে স্থানীয় ডাক্তারকে দেখানো হয় এবং পরে ট্রেকার ও নৌকা করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের নিয়ে কবি সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন— ''বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।

ম্যানগ্রোভ অরণ্যভূমি সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অবাধ বিচরণভূমি। সুন্দরবন টাইগার বিজার্ভের ''কোর এরিয়ার' আয়তন ১৩৩০.১২ বর্গ কিলোমিটার। এই কোর এরিয়া ছাড়াও ৩৬২.৩৩ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত সজনেখালি, ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, সুধন্যখালী, বনবিবি ভারনী, পীরখালী, গাজীখালী, নঁ-বাকী, পঞ্চমুখালী, নেতী ধোপানী, ঝিঙ্গাখালী ও এই টাইগার বিজার্ভের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও রয়েছে ১২৫৫ বর্গ কিলোমিটার ''বাফার এরিয়া''। ১৫টি ফরেস্ট ব্লক ও ৭০টি ফরেস্ট কমপার্টমেন্ট নিয়ে সমগ্র সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের বিস্তৃতি। ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে যত সংখ্যায় বাঘ রয়েছে তার মধ্যে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা সর্বাধিক। শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বের আর কোন বনে এত বাঘ নেই। গত ২০০৪ সালে ব্যাঘ্র শুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ২৭৪। ১৯৯৭, ১৯৯৯ ও ২০০১ সালে বাঘ গণনার সময়ে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ২২৮, ২৮৪ এবং ২৭১। দু'বছর অন্তর সাধারণত বাঘ গণনা করা হয়। দেখা যাচ্ছে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে, এখানে চোরা শিকারির দৌরাত্ম অনেক কম। এখানে মানুষ-খেকো বাঘের সংখ্যা ২টি মাত্র। বিচিত্র ভৌগলিক প্রকৃতি ও অবস্থান, নোনা জলে আধ ডোবা ম্যানগ্রোভ জঙ্গল-নদী-খাঁড়ির সমারোহ এক দুর্গমতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার কারণে এই টাইগার রিজার্বে বাঘের স্বাভাবিক বংশবিস্তারেরসহায়ক পরিবেশ। ২০০৪ সালে ছিল, বাঘ- ৯০টি, বাঘিনী- ১৪৭টি ও শাবক ৩৭টি। ২০০২ সালে বাঘ ছিল ১০০টি, বাঘিনী ১৪২টি এবং শাবক ২৯টি। অর্থাৎ শাবকের সংখ্যা ২৯টি থেকে বেড়ে ৩৭টিতে পৌঁচেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের রেকর্ড থেকে জানা গেছে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ১৫টি বাঘ মারা গেছে এবং ১৯৯৪-২০০১ সালের মধ্যে চোরা শিকারিদের কাছ থেকে ২১টি বাঘের চামড়া পাওয়া গেছে। সুন্দরবন বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। সুন্দরবন ১৯৭৩ সালে টাইগার রিজার্ভ, ১৯৮৪ সালে ন্যাশানাল পার্ক, ১৯৮৫ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং ১৯৮৯ সালে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসাবে ঘোষিত হয়। সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ এলাকা ২৬০০ কিলোমিটার।

সুন্দরবনকে নিয়ে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে ২৯টি সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প রয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে এরসূচনা। রাজস্থানের সরিস্কা প্রকল্প শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। বাঘ শুমারীতে দেখা গিয়েছিল ২৪-২৮টি বাঘ আছে সরিস্কায়। সেপ্টেম্বর ২০০৪-এর পর সরিস্কায় কোন বাঘ দেখা যায়নি। সেই দিক থেকে দেখলে বাঘের ব্যাপারে সুন্দরবন এখন সেরা।

পান্না সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প নিয়ে নানা কথা উঠছে, যেমন পান্না থেকেও বিলুপ্তির পথে বাঘ। সরিস্কা, রণথম্ভোরের পর

এরপর ৭ পাতায়

বিপদ বাড়ছে ঘরেও

দূষণ! পরিচিত একটি শব্দ, ঘটনা। দূষণে-দূষণে সবাই অস্থির। বাইরের দূষণ তো আছেই, বিপদ বাড়ছে ঘরেও। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঘর (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে) গুলো আজ আর নিরাপদ নয়। বাইরের পরিবেশের দূষণ যেমন ঘরে ঢুকছে, তেমনই ঘরগুলোও হয়ে উঠছে দূষণের উৎস। ফলে, সমাজের একটা বিশাল অংশ এই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রথমেই মহিলারা, তারপরই শিশু এবং বৃদ্ধেরা। শুধুমাত্র বাড়িঘর থেছকেই প্রতিনিয়িত ৮২ শতাংশ সালফার ডাই-অক্সাইড, ৩৮ শতাংশ নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, ৮৮ শতাংশ উদ্বায়ী জৈব যৌগ এবং ৯৬ শতাংশ পার্টিকুলেড ম্যাটার উৎপন্ন হয়। এগুলোর প্রধান উৎস রান্নাঘর এবং বিভিন্ন ধরনের জৈব জ্বালানী। বেশিরভাগ বাড়িতেই রান্নাঘরে ঠিকমতো বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে না, ফলে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যহানির শিকার মহিলারা। বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে যে ধরনের ফুসফুসের রোগ দেখা যায়, তার প্রধান কারণই রান্নাঘরের দূষিত বাতাস। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এই রান্নাঘরেই মেয়েরা ৯০ শতাংশ সময় কাটান। জৈব জ্বালানীর দহনজনিত যেসব দূষিত পদার্থ বের হয়, তার ফলেই আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু মারা যায়। তবে, এখনও ভারতে শিশুমৃত্যুর প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ অপুষ্টি ও ডায়েরিয়া। শুধুমাত্র নুনজলের অভাবেই এ'দেশে প্রতিবছর মারা যায় পনের লক্ষেরও বেশি শিশু। ভারতে অন্ধত্ব ও চোখের নানান অসুখের সমস্যা ব্যাপক। জৈব জ্বালানির ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসা কমিয়ে ফেললে এই ধরনের অন্ধত্ব হ্রাস পাবে অনেকটাই। কাঠের ধোঁয়াতেও বেনজোপাইরিন ও ফরম্যালডিহাইড থাকে। একজন ধূমপায়ী গড়ে চল্লিশটি সিগারেট খেলে যে ক্ষতি হয় তারচেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ ক্ষতির শিকার হচ্ছেন মহিলারা শুধুমাত্র উনানে রান্না করার কারণে।

লখনউতে, ২০০৬ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ছোট বাচ্চাদের (যারা এখন্য স্কুলে যায়নি) শ্বাসজনিত সমস্যা রয়েছে। শ্বাসজনিত লক্ষণের মধ্যে আছে সর্দি, কাশি, কফ, গলাব্যথা। গলায় ঘর্ঘর শব্দ, হাঁচি আর শ্বাসকষ্ট। এরা বাড়িতে, মায়ের কাছাকাছি সময় কাটায় বেশি। রান্নাঘর বা বাড়িতে যদি ধোঁয়া বেরোনোর ভালো ব্যবস্থা থাকে— তবে, শ্বাস সংক্রান্ত অসুখ কমে যায় অনেকটাই।

এছাড়াও, তামাকজাতীয় দাহ্য পদার্থ, গৃহনির্মাণের যাবতীয় সামগ্রী, পুরনো আসবাবপত্র, অ্যাসবেস্টাস, স্যাঁতসেঁতে ভিজে কার্পেট, বিভিন্ন রকমের সুগন্ধি স্প্রে (রুম ফ্রেশনার), কীটনাশক (স্প্রে বা ম্যাট), এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি থেকেও ঘরগুলো দূষিত হয়। ফলে, বাড়ছে স্বাস্থ্য সমস্যা। আমরা বাইরের দূষণ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি কিন্তু, এখনও অনেকেই জানি না ঘরের ভিতরকার দূষণ সম্বন্ধে।

জৈব জ্বালানিতে উৎপন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ ও স্বাস্থ্য সমস্যা

উৎস : জৈব জ্বালানি

ঘুঁটে, কাঠ, কেরোসিন, কয়লা প্রভৃতি। অর্থাৎ উনানের ধোঁয়া।

উৎপন্ন পদার্থ ও স্বাস্থ্য সমস্যা

কার্বন মনোক্সাইড (CO) — শরীরের কোষে-কোষে অক্সিজেন যেতে বাধা দেয়।

সূক্ষ্ম কণা — চোখজ্বালা, চোখের দৃষ্টি হ্রাস।

বেনজো পাইরিন — ক্যান্সার

ফরম্যালডিহাইড — চোখ, নাক, শ্বাসনালীতে জ্বালার সৃষ্টি করে। এটি কারসিনোজেনিক।

— ড. সোমা বিশ্বাস

সুন্দরবনের বাঘ

৭ পাতার পর

মধ্য প্রদেশের পান্না ব্যাঘ্র প্রকল্পে দেশের বাঘের সব চেয়ে বড় ডেরা বলে পরিচিত এই জঙ্গলে বর্তমানে (আগষ্ট'০৭), বড় জোড় ৫-৭টি বাঘ অবশিষ্ট। এবং এদের সব কয়েকটি পুরুষ বাঘ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করছে। বাঘ ভারত থেকে বিলুপ্তির পথে। একের পর এক অভয়ারণ্য, ব্যাঘ্রপ্রকল্প থেকে দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্চে বাঘ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এক সময়ে পান্নায় ৩০টি বাঘ ছিল। গত একমাসে একটিও বাঘিনী দেখা যায়নি স্ত্রী বাঘের অভাবে এখানে বাঘের প্রজনন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পান্না নিয়ে সতর্কবাণী অবশ্য এর আগেও করা হয়েছিল। বাঘ সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ রঘু চান্দাওয়াত ২০০৫ সালে বলেছিলেন, পান্না থেকে ২৩টি বাঘ নিখোঁজ। দেরাদুনের ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরাও গত কয়েক মাসে স্ত্রী বাঘ দেখেনি। ৫২ নম্বর স্ত্রী বাঘটির বয়স ছিল ১৬ বছর। সে আর তার মেয়েই ছিল পান্নায় স্ত্রী বাঘের দু'টি মাত্র প্রতিনিধি। কিন্তু তাদেরও মাস খানেক ধরে দেখা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওই দুইটিও মারা গিয়েছে বা চোরা শিকারীরা মেরে ফেলেছে। *

মধ্য প্রদেশ সরকার জানে পান্নায় বাঘ বিপন্ন। বনদপ্তরের অফিসাররা বলেছিলেন, বান্ধবগড় থেকে স্ত্রী বাঘ এনে প্রজননের চেষ্টা করা যায় কিনা? সমস্যা ছিল বলেই এই প্রশ্ন উঠছে। পান্নার গা-ঘেঁষা গ্রাম হিনোতা। সেখানকার সরপঞ্চ রাম যাদবের কথায়, "আগে বনে আমাদের গ্রামের গরু-ছাগল চরতে গেলে অনেক সময়েই একটা, দু'টোকে বাঘ তুলে নিয়ে যেত। এখন ওসব ঝামেলা নেই। বাঘই নেই। ঐ গ্রামে আদিবাসী লালুর অভিযোগ বনদপ্তরের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, বাঘ গণনারসময়ে একটা বাঘ দেখলেই অফিসাররা বলেন, 'লেখ ১০'। অফিসাররা বলেন পান্নায় ১৪টি বাঘ আছে। বিশ বছর ধরে কর্মরত নৈশপ্রহরীর কথায়, কোথায় আছে বাঘ, থাকলে তো নজরে পড়বে।

পান্নায় বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের দোহাংশ পাওয়া যাচ্ছে, ছবিও তোলা হয়েছে। যেগুলো দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পান্নায় চোরা শিকারিরা ভীষণ সক্রিয়। বন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ অফিসাররাও সে কথা খণ্ডন করতে পারেন না। সম্প্রতি সান্তনার এক চোরা শিকারির কাছ থেকে বাঘের নখ ও মাংস পাওয়া গিয়েছে— জানিয়েছেন পান্নার ফিল্ড ডিরেক্টর জি. কৃষ্ণমূর্তি।

সরিস্কা, রণথম্ভোরের মত পান্নাতেও টনক নড়েছে দেরিতে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্যান্য ব্যাঘ্রপ্রকল্পের কি অবস্থা সময় মত তা জানতে না পারলে শীঘ্রই ভারতে বাঘের স্থান হবে শুধুই ছবিতে।

— ভোলানাথ দত্ত, ২৩৫৮-৭৩৩০

রোগ ঘিরে কুসংস্কার

আগে ভাবা হত খারাপ বাতাস বা ম্যাল এয়ার শরীরে লেগে ম্যালেরিয়ার ঐ কাঁপুনি দেওয়া জ্বর হয়। এখন জানা গেছে মশার কামড় থেকে ছড়ানো এক পরজীবীর কারণেই হয় ম্যালেরিয়া। বিজ্ঞানসম্মত তথ্য জানার ফলে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা যাচ্ছে। তবু ম্যালিরিয়া নামটির মধ্যে প্রাচীন ঐ মিথ্যা বিশ্বাস বা কুসংস্কারের অবশেষ থেকে গেছে। একইভাবে প্রাচীন ইয়োরোপে ভাবা হত নক্ষত্রের প্রভাবে অর্থাৎ ইনফ্লুয়েন্সে প্রবল জ্বর হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এখন তার পেছনে ভাইরাসের ভূমিকা জানা গেলেও নামটি এখনো প্রাচীন বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে চলেছে। হিস্টেরিয়া নামক মনোরোগটির কারণ হিসেবেও ভাবা হত মেয়েদের জরায়ু তথা হিস্টেরস ফেপে যাওয়া। তাই ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল। পুরনো ঐ ভাবনা ভুল প্রমাণিত হলেও হিস্টেরিয়া নামটি এখনো থেকে গেছে। আমাদের এখানে আবার হিস্টেরিয়ার মত ফিটের রোগটির কারণ হিসেবে এখনো মনে করা হয় ভূতের ভরের মত ব্যাপারগুলিকে। নবজাত শিশুর টিটেনাসকেও ভাবা হয় পেঁচো নামক এক অথদেবতার প্রভাব। তাই তাকে বলা হয় পেঁচোয় পাওয়া। বহু এলাকায় আবার অকালমৃত্যু বা মড়কের পেছনে ডাইনি নামক অপশক্তিকে দায়ি করা হয়। আর প্রায় ক্ষেত্রেই এলাকার কোন বৃদ্ধাই ডাইনি হয়ে গেছে ধরে নিয়ে তাকে মেরে ঐ মৃত্যু বা মড়ক আটকানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এর ফলে নরহত্যার মত একটি বীভৎস অপরাধ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। ডাইনি বলে কোন কিছু নেই বা এ ধরনের কোন অলৌকিক অপশক্তি হয় না — তা নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ না থাকলেও এখনো আমাদের দেশে রোগ ভোগ, মড়কের মোকাবিলায় ডাইনি হত্যা অর্থাৎ নারীহত্যা তথা নারীনিগ্রহের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে কিছু কিছু আধুনিক কুসংস্কারও, যা এই কিছুদিন আগেও ছিল না, যেমন এইডস রোগটিকে ঘিরে।

এই কিছুদিন আগে কলকাতার একটি বড় হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসক ও সেবিকা ভর্তি হওয়া এক এইডস রোগীর চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। তাঁদের ভয় ছিল ঐ রোগীকে ছুঁলে রোগটি তাঁদেরও হয়ে যাবে। সংবাদপত্রে বড় বড় করে এ খবরটি বেরিয়েছিল। শুধু এই হাসপাতালে নয়, উত্তর কলকাতায় এক এইডস রোগীকে তাড়া করে পাড়াছাড়া করার কিংবা গ্রামে গঞ্জে মফস্বলে এইডস রোগীকে এলাকা থেকে তাড়ানোর খবরও মাঝে মাঝেই বেরোয়। সব ক্ষেত্রেই ভয় করা হয়েছে যে এইডস রোগীকে ছুঁলে বা সে কাছাকাছি থাকলেই বুঝি অন্যদের মধ্যেও রোগটি ছড়িয়ে পড়বে। অথচ বিজ্ঞানসম্মত তথ্য হল, এইডস রোগীকে ছুঁলে বা সে কাছাকাছি থাকলেই বুঝি অন্যদের মধ্যেও রোগটি ছড়িয়ে পড়বে। অথচ বিজ্ঞানসম্মত তথ্য হল, এইডস রোগীকে ছুঁলে, তার সঙ্গে থাকলে, তাঁর ব্যবহার করা জামাকাপড় পরলে বা থানা বাসনে খেলে, তাঁকে হাল্কা চুম্বন করলে ইত্যাদি কোনভাবেই রোগটির ভাইরাস অন্যের শরীরে ছড়ায় না। শুধু ছড়ায় কোন না কোন ভাবে রক্তের সংযোগের মাধ্যমে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এতসব তথ্য জানা গেলেও এইডস রোগকে ঘিরে মিথ্যা কিছু রটনা ও বিশ্বাস শিক্ষিত-অশিক্ষিত বহু মানুষের মদ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটিকে রোগ ঘিরে কুসংস্কারের আধুনিক একটি উদাহরণ হিসেবেই অভিহিত করা যায়।

শীতলা দেবীর পুজো করলে বসন্ত সারে বা মা মনসার কৃপায় সাপে কামড়ানো রোগী ভাল হয়ে উঠবে কিংবা জগন্নাথের সঙ্গে কুষ্ঠের সম্পর্কের মত প্রাচীন কুসংস্কারগুলি প্রভাব আগের চেয়ে কিছুটা কমলেও, এখনো গ্রামেগঞ্জের বহু মানুষের মধ্যে আছেও। সঙ্গে জুটছে অন্যান্য দিকের মত রোগ-ব্যাধিকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন কুসংস্কারগুলিও যেমন এই এইডস রোগীকে ছুঁলেই এইডস হয়ে যাবে বা টনিক খেলেই রোগীর দুর্বল শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে কিংবা মেটাল ট্যাবলেট-এর মত হাবিজাবি কিছু শরীরে ধারণ করলে নানা রোগ সারবে এমন ধরনের মিথ্যা বিশ্বাসগুলি।

আসলে একদিকে অজ্ঞতা, অন্যদিকে রহস্যময় কোন কিছুতে অন্ধবিশ্বাস তথা যুক্তিবোধহীন অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা—এসব মিলিয়েই নানাবিধ কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়। নানা রোগের প্রসঙ্গেও এটি সত্য। আর তাকে ঘিরে চলে প্রতারণা ও ব্যবসা। সব মিলিয়ে ভোগান্তি হয় রোগী হিসেবে সাধারণ মানুষের। মা মনসার সঙ্গে সাপের বিষক্রিয়ার কোন সম্পর্কই নেই। অথচ এখনো আমাদের দেশের বেশ কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে সর্পদংশনে মৃত বা মৃতপ্রায় রোগীকে মনসার পুজো করে বাঁচনো যায়। তাই এমন রোগীকে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা না করিয়ে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়ার ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে। অর্শ থেকে হাঁপানি, মনোরোগ থেকে কোলাইটিস— নানাবিধ রোগের পিছনে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের মত হাস্যকর ও অবাস্তব কথাবার্তা প্রচার করা হয়। আর এদের মোকাবিলা করতে নানাবিধ গ্রহরত্ন, তাবিজ মাদুলি, শেকড়বাকড় ধারণ করার প্রেসক্রিপশান দেওয়া হয়। এদের নিছক মানসিক প্রভাব ছাড়া কোন রোগ সারাতে সত্যিকারের কোন ভূমিকা নেই। তবু লোক ঠকিয়ে এমন কারবার বেশ ভালভাবেই চলছে।

বিজ্ঞানমনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রসারই এসব আটকাতে পারে।

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ০৩৩-২৮৭৬০৭২০, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী– সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)*

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in